একক ২(খ) ❑ ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার : ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য

২(খ).১ প্রস্তাবনা

২(খ).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)

২(খ).৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানির আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)

২(খ).৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা

২(খ).৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠা শক্তি

২(খ).৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশুর

২(খ).৪ লর্ড কর্নওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-১৭৯৩)

২(খ).৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্যবিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)

২(খ).৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি

২(খ).৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা শক্তি

২(খ).৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩-১৮২৩)

২(খ).৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)

২(খ).৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন

২(খ).৮ অনুশীলনী

২(খ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- বিভিন্ন গভর্নর-জেনারেলদের নেতৃত্বে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনমূলক নীতিসমূহ;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাঠামোগত পরিবর্তন ও শাসকসংগঠন হিসাবে উত্তরণ;
- কোম্পানি একশত বৎসরের ভারত-শাসনের চরিত্র ও ফলাফল (১৭৫৭-১৮৫৭)।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য থেকে জানা গেল যে, এই এককে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন থেকে কীভাবে সামরিক আগ্রাসনের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল, তাই বিধৃত হয়েছে। যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও কৌশলগুলি কোম্পানি দেশীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল, তার চরিত্র, কার্যকারিতা ও ফলাফল, এবং সামগ্রিক বিচারে প্রথম একশ' বছরে কোম্পানির শাসনের পর্যালোচনা করাই এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য/উপজীব্য বিষয়।

২(খ).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)

১৭৫৭ সালের পরবর্তী দশকগুলিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা এশিয়া মহাদেশে মূলত বাণিজ্যের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিল, ভারতে তার বিজিত অঞ্চলগুলি শাসন করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। বাণিজ্যে লভ্যাংশ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভূমিরাজস্ব আদায়েও কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগ করে। ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম কৌতুহলোদ্দীপক ক্ষেত্র হিসাবে ঔপনিবেশিক যুগের শুরুতে কোম্পানি তার প্রশাসনিক সংগঠন কতটা পুরাতন দেশীয় কাঠামোকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলেছিল, তা নিয়ে প্রভূত গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতিতে যে এই যুগ একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা ও কাঠামোর জন্ম দেয়, যা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা নিয়ে সংশয় নেই।

একটি সামরিক স্বৈরতন্ত্র (military despotism)-এক আশ্রয় করে আঠারো শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রভুত্ব কব্জা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাও কোম্পানি 'দেওয়ান' হিসাবে কুক্ষিগত করে। অন্যদিকে নিজামতের—অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তারা নিয়েছিল। কোম্পানি আর্থিক আধিপত্য ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থের জোরে সেনাবাহিনীও পুষত, যার বেশিরভাগ 'সিপাহী আসত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে। ১৭৬৮ সালে কোম্পানির অধীনে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০; ১৮১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫,০০০-এ। ১৮১৪ সাল নাগাদ গোটা উত্তর ভারত জুড়েই এই 'সিপাহী'-দের নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল-আর্মি'-র দাপট দেখা যায়। এইভাবে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব খাটানো সত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে কোম্পানি সরাসরি কোন যোগাযোগ রাখত না। প্রশাসনের গলদের জন্যে নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসকজনিত সুবিধাগুলি কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত।

এইভাবে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজি ও কোম্পানির তরফে প্রবল চাপ তৈরি করা হয়। একাজে তারা দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে গোপন ও কার্যকরী সহযোগিতা লাভ করে। এর ফলে কোম্পানি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদনের উৎসগুলিকে ধ্বংস করতে পারে ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করার পর দেশীয় মধ্যবর্তী-পুঁজিকেও অচিরেই অধস্তন-পর্যায়ে ঠেলে সরাতে পারে। অর্থাৎ এককথায়, আঠারো শতকে সাম্রাজ্যবাদের স্পন্দনশীল ও অনুকুল অর্থনৈতিক

অভিঘাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যে আগ্রাসী ভূমিকা নেয়, তার ধাক্কায় উনিশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতি একটা গতিহীন, অবরুদ্ধ চেহারা নেয়।

২(খ).৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানীর আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশরা একটি বিশেষ ক্ষমতাধর শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংল্যান্ডে এর পরিচালকরা ভারতের অবশিষ্ট অংশে নতুনভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি হিসাবে বাংলায় তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করায় মনোনিবেশ করে। কোম্পানি ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছিল; নতুন নতুন রাজ্যজয় ও অর্থলালসাও তারা সংযত রাখতে পারেনি। কাজেই বাংলায় তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তারা বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন ও ১৭৭৪ সালে গভর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তাঁর আমলে অযোধ্যা রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে মারাঠাদের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। বস্তুতপক্ষে, হেস্টিংসের আমলেই কোম্পানির মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী উভয়েই যথাক্রমে মহীশূরে হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মারাঠা নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। অর্থাৎ তৎকালীন দেশীয় শক্তির তরফে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি পড়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে ফরাসিরাও সেইসময় এদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বস্থাপনে অন্যতম বাধা ছিল।

২(খ).৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা

হেস্টিংসের বিদেশনীতির মূল স্তম্ভভ ছিল অযোধ্যা—মূলত উত্তরভারতে অযোধ্যাকে শক্তিশালী একটি মিত্রশক্তিতে পরিণত করাই ছিল হেস্টিংসের উদ্দেশ্য। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে হেস্টিংস বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শর্তসাপেক্ষে সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক দৃঢ় করা। এই সূত্রেই কেম্পানি ১৭৭৪ সালে অযোধ্যার হয়ে রোহিলখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭১ সালে পুনরুজ্জীবিত মারাঠা শক্তি উত্তরভারতে দিল্লী দখল করলে মুঘল সম্রাট শাহ্আলম তাদের হাতে বন্দী হন এবং অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড উভয় শক্তির কাছেই মারাঠাদের উপস্থিতি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ১৭৭২ সালে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলা-আফগান নেতা হাফিজ আহ্মেদ খানের সঙ্গে একটি রক্ষণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার দ্বারা চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলাদের হয়ে মারাঠা বিতাড়ন করবেন, স্থির হয়। কিন্তু মারাঠারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করলেও সুজাউদ্দৌল্লা উপরোক্ত অর্থ দাবী করেন। এই অন্যায় দাবিপূরণে ওয়ারেন হেস্টিংসের পূর্ণসম্মতি না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি অযোধ্যাকে রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনে সামরিক সাহায্য দেয়। এই যুদ্ধের (১৭৭৪) ফলে রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়।

হেস্টিংসের ভূমিকা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। ঐতিহাসিক রবার্টস 'কেম্ব্রিজ ইতিহাসে' [P. E. Roberts—Cambridge History of India—Vol. VI] এবং ডেভিস তাঁর 'ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যান্ড আউধ' বইতে হেস্টিংসের কাজের সমর্থন করেন এই যুক্তিতে, যে, রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনের পিছনে অযোধ্যার একটি স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমান্তের যুক্তিটি খুবই জোরালো ছিল। এছাড়াও অযোধ্যা এরপর থেকে কোম্পানির নিজস্ব সুরক্ষার প্রশ্নে 'প্রথম সীমান্তে'র কাজ করে ও কোম্পানি আর্থিকভাবেও নবাবের কাছ থেকে প্রভূত অর্থলাভ করে। কিন্তু অচিরেই তাঁর নিজের কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারাই হেস্টিংস প্রভূতভাবে সমালোচিত হন মূলত এক্ষেত্রে তাঁর কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য।

অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড ছাড়াও হেস্টিংস পুনরায় প্রবল সমালোচিত হন বেনারসের রাজা চৈত সিং-এর ঘটনায় ও অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করার ঘটনায়। মূলত মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও কর্ণাটকের যুদ্ধে কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ব্যয় হয়ে যায় ও কোষাগার পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে হেস্টিংস, 'কোম্পানির স্বার্থেই' দেশীয় শক্তিগুলির সম্পদ লুঠ ['squeezing' wealthy natives to support India's 'pacification'] করতে প্রবৃত্ত হন। বস্তুত, উত্তরভারতে বেনারস বাণিজ্যিক লেনদেন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেছিল। ১৭৭৯ সালের পর থেকে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে হেস্টিংস বেনারসের রাজাকে চাপ দিতে থাকেন, যাতে বার্ষিক দেয় ৪৫ লক্ষ টাকার ওপরেও বাড়তি অর্থ দেওয়া হয়। চৈত সিং তা দিতে অপারগ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর বিরুদ্ধে সেনা-অভ্যুত্থান হলে হেস্টিংস তাঁর দাবিতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই অভ্যুত্থান বস্তুতই হেস্টিংসের কূটনৈতিক ব্যর্থতা-জাত বলে সমালোচিত হয়েছে।

একইভাবে ১৭৮২ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত কোম্পানির আর্থিক দাবি মেটাতে হেস্টিংস অন্যায়ভাবে অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করেন, এই অজুহাতে যে, তাঁরা চৈত সিং-কে সমর্থন করেছিলেন।

২(খ).৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠাশক্তি

কোম্পানির পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে অযোধ্যা যদি হেস্টিংসের কাছে নির্ভরতার প্রথম স্তম্ভ ছিল, তাহলে দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল মারাঠাশক্তির বিরোধিতা। ১৭৬১-তে পাণিপথে শোচনীয় পরাজয়ের পর মারাঠাশক্তি কার্যত ছিন্নশক্তিতে পরিণত হয়। দক্ষিণে নিজাম ছিল তাদের প্রধান শত্রু। এর ওপর, ১৭৭২ সালে পেশবা মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর কার্যত মারাঠারা উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অযোগ্য রঘুনাথরাও-এর ক্ষমতালিপ্সা, মাধবরাও-এর পুত্র পেশবা নারায়ণ রাও -এর হত্যা (১৭৭৩), পেশবাতন্ত্রের রক্ষক ও রঘুনাথ রাও-বিরোধী শিবির হিসাবে পুণেতে নানা ফড়নবিশ-এর নেতৃত্বে মারাঠা গোষ্ঠীতন্ত্রের উত্থান—এ সবই দক্ষিণে কোম্পানির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। ইতিমধ্যে মৃত নারায়ণ রাও-এর পুত্রের জন্ম হলে হতাশ রঘুনাথ রাও পেশবা পদের দাবিদার হিসাবে কোম্পানির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন সলসেট—যা বোম্বাই-কর্তৃপক্ষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তার বিনিময়ে রঘুনাথ রাও-কে কোম্পানি সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সলসেট দখল করে ও রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে 'সুরাটের চুক্তি' স্বাক্ষর করে। রঘুনাথ রাও কোম্পানিকে সলসেট ও বেসিন প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও ব্রোচ ও সুরাটের রাজস্বের এক অংশ দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব বোম্বাই-কর্তৃপক্ষ ২৫০০ সৈন্য দিয়ে (যার ব্যয়ভার অবশ্যই রঘুনাথ রাও বহন করবেন) পুণে-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

১৭৭৫-৮২ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা-কর্তৃপক্ষ সুরাটের চুক্তি 'অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপজ্জনক' বলে সাব্যস্ত করলে নতুন করে পুণে-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজদের আলোচনা শুরু হয়। ১৭৭৬ সালে পুরন্দরের চুক্তির মাধ্যমে মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানি নতুন লেনদেনের শর্তে আবদ্ধ হয় যার বলে রঘুনাথ রাও-কে নির্বাসনে পাঠানো হয়, সলসেট ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ব্রোচের রাজস্বের এক অংশ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বাবদ বার লক্ষ টাকা কোম্পানি আদায় করে।

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ও বোম্বাই-কর্তৃপক্ষ ও রঘুনাথ রাও—কেউই পুরন্দরের চুক্তি সমর্থন না করলে পুনরায় মারাঠাশক্তি ও কোম্পানীর সৈন্য মুখোমুখি হয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সেনাবাহিনী মারাঠা সৈন্যের মুখোমুখি হয় ও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াদগাঁও কনভেন্শনের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু হেস্টিংস এই সমঝোতার বিরোধিতা করলে পুনরায় মারাঠা-ইংরেজ শক্তি পরীক্ষার সূচনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে মারাঠা, হায়দার আলি ও নিজামকে নিয়ে একটি ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে উঠলে দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির কূটনৈতিক ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একদিকে মাদ্রাজ-কর্তৃপক্ষ নিজামের প্রতিদ্বন্দ্বী বসালাত জঙ্গকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলে নিজাম বৃটিশ বিরোধী হয়ে ওঠেন; অন্যদিক মহীশূরের হায়দার আলিও মালাবারে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার ও মাহে বন্দর দখলের প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। অতএব দক্ষিণী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-বিরোধিতায় একত্রিত হয়ে ঠিক করে যে নিজাম 'উত্তর সরকার' দখলে অগ্রসর হবেন, হায়দার আলি কর্ণাটক দখলে অগ্রসর হবেন, বেরার-এর ভোঁসলে বাংলা আক্রমণ করবেন ও মারাঠারা বোম্বাই এলাকায় হানা দেবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এইসময় অসম্ভব কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ভোঁসলে ও নিজামকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নিবৃত্ত করেন ও ব্রিটিশ সেনাপতি গডার্ড পরপর অভিযানে গুজরাটের আমেদাবাদ, বেসিন ও কোঙ্কন দখল করে নেন। অন্যদিকে পরাক্রমী মারাঠা সেনাপতি মহাদ্জী সিন্ধিয়াকেও হেস্টিংস দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ চালান।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস মহাদ্জী সিন্ধিয়ার মাধ্যমেই পুণে-কর্তৃপক্ষের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। সিন্ধিয়া এই চুক্তির রূপায়ণে একদিকে পুণের রাজনৈতিক-কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও অন্যদিকে কোম্পানির কাছে চুক্তি রূপায়ণের মুখ্য জামিনদার হিসাবে রইলেন।

সলবঈ চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ সলসেট অধিকার করে; রঘুনাথ রাওকে অবসরভাতা দেওয়া হয়; মহীশূরের বিরুদ্ধে পুণে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ানো হয়; এবং সর্বোপরি পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্কে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়—যে সময়টির মধ্যে ইংরেজরা বাংলায় তাদের শাসন সংহত করে নেয়। অন্যদিকে মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের শক্তি সংহত না করে পারস্পরিক তিক্ত বিবাদে এই সময়ের অপচয় করে।

২(খ).৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশূর

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এর আগে হায়দার আলি একের পর এক যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন, বহু ইংরেজ-সৈন্য আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধেও হায়দারের সেই পুরানো রণকুশলতা অব্যাহত ছিল। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র কর্ণাটক

অঞ্চল তাঁর করতলগত হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামকে ঘুষ দিয়ে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৭৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা ভীতি থেকেও কোম্পানি চুক্তির দ্বারা মুক্ত হলে পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে ব্রিটিশরা এখন মহীশূরের বিরুদ্ধে নামে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সেনাপতি আয়ারকূটের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী পোর্টোনোভো-র যুদ্ধে হায়দার আলি-কে পরাস্ত করে। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্ভবর মাসে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। এর শর্ত অনুসারে পরস্পরকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে হয়েছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস যে দাবি করেন তা এইরকম : "মারাঠা যুদ্ধের মূল কারণ ও সূত্রপাত নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমার মূল দায়িত্ব ছিল একটি প্রেসিডেন্সিকে (বোম্বাই) কুখ্যাতি ও দুটি প্রেসিডেন্সিকেই (বোম্বাই ও মাদ্রাজ) ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো।"

২(খ).৪ লর্ড কর্ণওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-৯৩)

কেবল গভর্নর জেনারেল হিসাবেই নয়, কোম্পানির সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হিসাবেও লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসেন। পিটের ভারত আইনে কোম্পানির গ্রাসী ভূমিকার ওপর প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হলেও কর্নওয়ালিসের সময় মহীশূরের বিরুদ্ধে (১৭৮৯) কোম্পানি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মহীশূরের সম্পদ, যা অবশ্যই কোম্পানির কাছে বাংলা ও মাদ্রাজের আর্থিক লোকসানকে চাঙ্গা করার জন্য লোভনীয় ছিল, কর্নওয়ালিসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। ১৭৯২-এ টিপু সুলতানের পরাজয়ের ফলে মালাবার উপকূল কোম্পানি দখল করে। এই যুদ্ধে কোম্পানি পেশবা ও নিজামের সহযোগিতা লাভ করেছিল। মারাঠারা এই সময়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে উত্তরে প্রবল আগ্রাসন চালাচ্ছিল। টিপুর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সমসাময়িক কোন দেশীয় শক্তিই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার দুরদর্শিতা দেখায়নি।

২(খ).৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)

ভারতে লর্ড ওয়েলেসলির (লর্ড মর্নিংটন হিসাবে আগমন ও টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর 'মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি' উপাধি লাভ) আগমন ইউরোপ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতির সমসাময়িক। নেপোলিয়ন সেই সময়ে (১৭৯৮-৯৯) ইংল্যান্ডের সমুদ্র আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে ইজিপ্ট আক্রমণ করেছেন। ১৮০৫ সাল অবধি ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে—'were nervous with apprehension and tense with resolution' ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ওয়েলেসলির সময় পর্যন্ত দেশীয় রাজদরবারগুলি ভাড়াটে ফরাসি সৈন্য বা সেনাপতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল—এক্ষেত্রে সিন্ধিয়া, কিংবা নিজাম বা, টিপু সুলতান, সকলেই ফরাসী-যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ভারতে ফরাসী-ভীতিই বাস্তবিকভাবে ওয়েলেসলির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে দেয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে যাবতীয় ফরাসী প্রভাব মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওয়েলেসলি এতদিনের কোম্পানির রক্ষণশীল নীতিকে ত্যাগ করে আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ফরাসী বিতাড়নের মত নেতিবাচক কর্মসূচীর পাশাপাশি ভারতে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে ব্রিটিশদের উত্থানের মত ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ—যা ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। ব্রিটিশ প্রভুত্বের ও সার্বভৌম ক্ষমতার সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ওয়েলেসলির মতে, এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল যা হবে চুক্তিনির্ভর ও গোটা ভারতব্যাপী। এই আক্রমণাত্মক সবগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট্-এর ভারত আইন (Pitt's Indian Act—1784)-এর পরিপন্থী ছিল। কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ ততদিনই ওয়েলেসলির এই নীতির বিরোধিতা করেননি, যতদিন তা কোম্পানির স্বার্থবিরোধী হয়নি।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মহীশূর ও মারাঠা এই দুই বৃহৎ শক্তির গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর মহীশূর বা কর্ণাটক রাজ্য তার অতীত-গৌরব ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মারাঠা সর্দাররা পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্ভবাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই অনুকূল পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছিল যে, ব্যবসায়িক স্বার্থের ক্ষতি না করে রাজ্যবিস্তার নীতি মুনাফালাভের সম্ভভাবনাকেই বাড়িয়ে তুলবে।

২(খ).৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি

রাজনৈতিক দিক থেকে লর্ড ওয়েলেসলির নীতি ছিল ত্রিমুখী। অধীনতামূলক মিত্রতা, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও কোন সময়ে বিজিত রাজ্যগুলি দখল—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। দেশীয় রাজ্যে কিছু কোম্পানির সৈন্য মোতায়েন রেখে প্রতিবেশী আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দান ও সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের ব্যয়ভার ওই রাজ্যের কাছ থেকে আদায় করা—এই প্রচলিত পুরাতন নীতি-র বদলে ওয়েলেসলি এমন কৌশলে চুক্তির শর্ত সাজালেন, যাতে এই আশ্রিত রাজ্যগুলি কোম্পানির সর্বময় প্রভুত্বের আওতায় এসে পড়ে। ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি কার্যক্ষেত্রে ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থার বিনিময়ে সৈন্যবাহিনীর খরচ ওই রাজ্যের কাছেই কোম্পানি আদায় করবে। শুধু তা-ই নয়, উপরন্তু এই নীতির বলে রাজ্যটির তরফে কোম্পানির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভারের নামে কোম্পানিকে রাজস্ব বা কর দান করতে হবে। অনেক সময় ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কবলিত শাসক বা রাজ্যকে বাৎসরিক খাজনার বদলে তার রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হত। এই 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থায় প্রায়ই কিছু শর্তও জড়িত থাকত—যেমন, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে রেসিডেন্টরূপে রাখতে হবে; ব্রিটিশের বিনা অনুমতিতে কোনো ইউরোপীয় (অ-ইংরেজ) কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না, এবং গভর্নর জেনারেলের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসক প্রতিবেশী রাজ্যের কোনো বিষয়ে কোনো কথাবার্তা চালাতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থা ছিল একটা ফাঁদ। কোনো রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া ছিল এই চুক্তির অর্থ। শুধু পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাই নয়, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ক্রমশই দেশীয় রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করত। এছাড়াও ব্রিটিশ-সেনার ভরণপোষণের খরচ চালাতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে

বাধ্য হত রাজা ও তার করভারপীড়িত প্রজাসাধারণ। এর ওপর 'আশ্রিত' রাজ্যগুলির নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ায় পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও সেনানায়করা জীবিকাচ্যুত হয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে দারিদ্র্য ও নৈতিক পতন দেখা দেয়। অন্যদিকে 'মিত্রতার' বন্ধনে আবদ্ধ দেশীয় রাজারা তাদের প্রজাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও ক্রমে চ্যুত হন, যখন প্রজাবিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা আর থাকে না, কারণ সাহায্যের জন্য কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্য রয়েছে।

অতএব ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি অত্যন্ত সুবিধার হাতিয়ার হয়। ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে পারত; যে-কোনো সময় আশ্রিত রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই দেশীয় রাজ্য অধিকার করা যেত। অতএব, ওয়েলেসলির সময়ে যত এলাকা ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়েছিল 'অধীনতামূলক মিত্রতা'-র কৌশলে, আর কখনও তা হয়নি। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গাপত্তমের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং মহীশূরের প্রায় অর্ধাংশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় ও মাদ্রাজের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূল যুক্ত হয়। মহীশূরের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা জোটে নিজামের ভাগ্যে—কারণ ১৭৯৯-এর যুদ্ধে মহীশূরের বিরুদ্ধে তিনি কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন। বাকি এলাকা মহীশূরের পুরোনো হিন্দু রাজবংশকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যার দ্বারা নিজামের সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়। নিজস্ব বাহিনীর পরিবর্তে, বাৎসরিক ২৪১,৭১০ পাউন্ড ব্যয়ের বিনিময়ে, কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ-সৈন্য তাঁর রাজ্যরক্ষা করত। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত আর একটি চুক্তির দ্বারা নিজামের রাজ্যে কোম্পানির সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাঁর রাজ্যের একাংশের বিনিময়ে (তুলা-উৎপাদনে সমৃদ্ধ বেরার প্রদেশ)।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাবকে বাধ্য করা হল এই চুক্তি সম্পাদনে, যার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ নবাব তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধ পশ্চিম দোয়াব ও রোহিলাখণ্ড এলাকা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। লক্ষ্ণৌ চতুর্দিক দিয়ে ব্রিটিশ-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। অবশিষ্ট 'আউধ' রাজ্যেও নবাবের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়; স্বরাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও কোম্পানির প্রতিনিধি ও আরক্ষা বাহিনীর হাতেই রইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। একদিকে পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও অন্যদিকে দক্ষিণের তাঞ্জোর কোম্পানির অধিকার আসে। অতঃপর ভারতের ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠারাই মুখ্য স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এইবার ওয়েলেসলি মারাঠাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

২(খ).৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা

মারাঠাজাতির দুর্ভাগ্যবশত, আঠারো শতকের শেষদিকে একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নায়কের অভাবে তারা যৌথ ও বিকেন্দ্রীভূত একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে, যার মুখ্য নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্দেশ্য ওস্বার্থসাধনে মনোযোগী ছিলেন। যেমন পুণেতে পেশবা, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার, নাগপুরে ভোঁসলে ও বরোদায় গায়কোয়াড় বংশ। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, কি অহল্যাবাঈ, পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাও-এর পরে শেষ উল্লেখযোগ্য মারাঠা কূটনীতিজ্ঞ নানা 'ফড়নবিশ সকলেই আঠারো শতকের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, নতুন মারাঠা সর্দাররা কেউই

ব্রিটিশ আগ্রাসনকে যোগ্য গুরুত্ব না দিয়ে আত্ম-সিদ্ধিসাধনে তীব্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। একদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ও অন্যদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর হোলকার, পেশবা ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির মিত্রতা প্রস্তাবে রাজী হলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অসহায় ও ভীত পেশবা ব্রিটিশ হুমকির সামনে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ও 'সাধারণ প্রতিরক্ষা আঁতাত' হিসাবে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'বেসিনের চুক্তি' হিসাবে খ্যাত হয়, যার বলে কোম্পানির সৈন্য পেশবার ভাতায় স্থায়ীভাবে পুণেতে বহাল হল এবং এর ব্যয়ভার হিসাবে পেশবার রাজ্যাংশ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়কারী এলাকা কোম্পানির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বহিঃশত্রু নয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদানেও এই সেনাবাহিনী বহাল হয়। সুরাট নগরী ও নিজামের এলাকার ওপর থেকে 'চৌথ' আদায়ের দাবিও পেশবা কোম্পানিকে ছেড়ে দেয়। ইংরেজ ব্যতিরেকে অপর কোনো ইউরোপীয় শক্তির বা সেনা-প্রশিক্ষণে সাহায্য গ্রহণ পেশবার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল।

বেসিনের চুক্তি গোটা দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে, যা ইতিমধ্যেই নিজামের অধীনতামূলক চুক্তিতে বশ্যতা স্বীকার, বা টিপু সুলতানের পতন অথবা আর্কটের নবাবের রাজ্য কোম্পানির দ্বারা অধিগ্রহণের দ্বারা নিকটস্থ হয়েছিল। উত্তরভারতেই মূলত হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যদিও দীর্ঘদিন আগেই পেশবা তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়েছিলেন, তবু এই চুক্তি আনষ্ঠানিকভাবে মারাঠা আধিপত্য নষ্ট করে।

অন্যদিকে তৎকালীন বোর্ড অফ কন্ট্রোল এই চুক্তির বিরোধিতা করে যেহেতু তা সরাসরি পিট্-এর ভারত আইন (১৭৮৪) ও ১৭৯৩ সালের চার্টার আইনের উল্টো পথে চলেছিল। উপরোক্ত দুটি আইনেই কোম্পানি দ্বারা কোন দেশীয় রাজ্য বলপূর্বক অধিগ্রহণে কিছু প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছিল। রাজনৈতিকভাবেও, বোর্ড অফ কন্ট্রোল সভাপতি এই চুক্তির বিরোধিতা করেন কারণ, ভবিষ্যতে কোম্পানি মারাঠা রাজনীতির অশান্ত ঘূর্ণিতে আরও জড়িয়ে পড়বে—এই আশঙ্কায়। এই আশংকাকে সত্যি প্রমাণ করে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ১৮০৩ সালে ও হোলকার ১৮০৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

কিন্তু এই বিপদের দিনেও মারাঠা নেতারা একত্রিত হয়ে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারেননি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন অস্ত্র ধরলেন, তখন হোলকার তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, গায়কোয়াড় মিত্র হিসাবে ইংরেজদের সাহায্য করলেন, এবং যখন হোলকার বিপদগ্রস্ত হলেন, তখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া নির্বিকার রইলেন। ভারতে কোম্পানিই যে প্রধান শত্রু ও তার সামরিক ক্ষমতা কত—সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই মারাঠা নেতারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

দাক্ষিণাত্যে আর্থার ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাই-নামক স্থানে ও নভেম্বর মাসে আরগাঁও-তে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী ১৯০৩ সালের নভেম্বরে সিন্ধিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে আলিগড়,

দিল্লি, আগ্রা সব দখল করে নেন। পুনরায় মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম ব্রিটিশদের আশ্রিত হন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে উভয়কেই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতাভুক্ত হতে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যাংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিত মেনে নিয়েছিল। অতএব, উপকূলীয় উড়িষ্যা থেকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ—সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

এতদিন যশোবন্ত রাও হোলকার নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে ছিলেন এই বিশ্বাসে যে, দীর্ঘ, ক্লান্তিকর অভিযানে ব্রিটিশশক্তি হতোদ্যম হয়ে পড়লে তাদের আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করা সহজ হবে। হোলকারের সহযোগী ভরতপুরের রাজা ইংরেজ সেনাপতি লেকের আক্রমণই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন। এই অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারেরা সচেতন হয়ে ওঠেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যাপক সামরিক অভিযানের পিছনে তুমুল ব্যয়স্বীকারে কোম্পানির লাভের অঙ্কে টান ধরছে। কোম্পানির ঋণের মাত্রা ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল £ ১৭ মিলিয়ন, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় £ ৩১ মিলিয়নে। অপরদিকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্ক ও প্রস্তুতি স্বদেশে ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন করে তুলেছিল। অতএব আর যুদ্ধ নয়—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ লর্ড ওয়েলেসলিকে ইংল্যান্ডে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয় বারের ও অত্যন্ত অল্পকালের জন্য ভারতে পুনঃপ্রেরিত হন।

লর্ড ওয়েলেসলি, যাঁকে 'নব্য মুঘল' বলে অভিহিত করা হয়েছে (স্ট্যানলি উলপার্টের ভাষায়), প্রকৃতপক্ষে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "ব্রিটিশের ভারতীয় সাম্রাজ্যে" রূপান্তরিত করেন [The British Empire in India became the British Empire of India.]। নিজাম, টিপু সুলতান, মারাঠা নেতৃবৃন্দ—প্রতিটি দেশীয় শক্তির ভরকেন্দ্রগুলিকে তিনি ধ্বংস করেন। মুঘল সম্রাট যিনি লর্ড ওয়েলেসলির মতো মদগর্বী ও জেদী ইংরেজ প্রশাসকের কাছ থেকেও সম্মান আদায় করে নেন—শাহ্ আলমকে ওয়েলেসলি কোম্পানির আশ্রিত করে তোলেন। দক্ষিণে মহীশূর, আর্ক, অযোধ্যা—এই ত্রিশক্তির রাজ্য গ্রাস করে মারাঠা শক্তিকেও পদানত করেন। তাঁর অসমাপ্ত আগ্রাসী নীতি, কয়েক বছর বিরতির পর, লর্ড হেস্টিংসের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

শুধু যুদ্ধই নয়, একজন সুদক্ষ সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসক হিসাবেও তিনি কোম্পানির সাম্রাজ্যের ভিতকে সুসংহত করেন। ইংল্যান্ড থেকে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশে সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রশাসন সম্পর্কে সুদক্ষ করে তুলতে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কোম্পানির আমলে ভারতে বিখ্যাত প্রশাসনিক কর্মচারীদের অধিকাংশই—যেমন মানরো, মেটকাফ, ম্যালকম বা, এলফিনস্টোন—লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে জীবন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনে ভারতে কোম্পানির শ্যসনব্যবস্থার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

২(খ).৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩—২৩)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা প্রধানদের শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ করে দিলেও ধ্বংস করে দিতে পারেনি। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তাঁদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে শেষ চেষ্টা চালান। ইংরেজ রেসিডেন্টের কঠোর

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও মারাঠা প্রধানদের মিলিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই শেষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পেশবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আরও একবার মারাঠারা এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কর্মধারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশবা পুণের ইংরেজ রেসিডেন্টের কার্যালয় ও বাসভবনে হানা দেন। নাগপুরের আপ্পা সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন। এই রেসিডেন্সিগুলি ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে মাধব রাও হোলকারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রস্তুতি নেন।

লর্ড হেস্টিংস সমুচিত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মারাঠা স্পর্ধার জবাব দেন। পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খিস্টাব্দের ১৮ই জুন আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁর পদ বিলুপ্ত করা হয় তাঁর এলাকা গ্রাস করে বর্ধিত আয়তনের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। তাঁকে একটা ভাতা মঞ্জুর করে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। হোলকার ও ভোঁসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মারাঠা প্রধানরাই নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এরপর থেকে ভারতের অন্যান্য স্থানের দেশীয় নৃপতিদের মতো মারাঠাশক্তির পতনের মূল কারণ—বেইলির মতে, সাধ্যাতিরিক্ত বিস্তার ও আগ্রাসন তাদের মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরায় [rapid expansion of their politics created fractures]।

এইভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। বাকী অংশ বহুসংখ্যক দেশীয় রাজা ও নবাবদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশের সর্বময় প্রভুত্বের অধীনে পরিচালিত হত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অযোধ্যার মতো দেশীয়, নিজস্ব সেনাবাহিনীকে কোনো কাজে না লাগিয়ে বাড়তি ভাতা দিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে কাজে লাগানো হত। বহির্জগত কিংবা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও দেশীয় শাসকবর্গের রইল না। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনেও রেসিডেন্টের তরফে হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়তে লাগল। এইভাবে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে কোম্পানি একদিকে নজর দিল পাঞ্জাবের দিকে এবং অপরদিকে সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাঁরা ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপের দিকে ঝুঁকল।

২(খ).৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)

অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মূল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ডালহৌসীর আমলে তা ধার হারিয়ে ফেলে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল অযোধ্যা বা আউধ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে অযোধ্যার নবাব বাৎসরিক বিপুল অঙ্কের করপ্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোম্পানির কাছ থেকে সুরক্ষা ক্রয় করেন। করের দেয় টাকা যোগাড় করতে গিয়ে নবাব ক্রমশই রাজ্যের অধীনস্থ জমিদার, রায়ত সেনাবাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীকে বিরূপ ও বিরক্ত করে তুলছিলেন, কারণ রাজ্যের এই ক্রম দেউলিয়াকরণে তাদের ভাগের প্রাপ্য অর্থ ও বেতন তারা পাচ্ছিল না। এই চুক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে নবাব ক্রমশ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছিলেন। উত্তর ভারতে এইভাবে অযোধ্যা ও দক্ষিণে

আর্কট উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলি-র মতে—"the financial demands of the alliance merely served to erode the basis of the state, and ultimately to provide the conditions for British annexation," অর্থাৎ আর্থিক দাবিদাওয়া ক্রমশ রাজ্যের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়, ফলে ব্রিটিশ আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও সহজ হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে আসেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ডালহৌসী চেয়েছিলেন ভারতের যতটা অঞ্চলে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ অধিকার বা শাসন ব্যপ্ত করা সম্ভভব তা তিনি করে যাবেন। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতাহরণ সুনিশ্চিত, তবে সেটা কিছু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।" ডালহৌসীর এই নীতির পিছনে ছিল তাঁর এই ধারণা যে, দেশীয় শাসকদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাপীড়ন ও দুর্নীতিপুষ্ট। সেই তুলনায় ব্রিটিশ-ভারতের শাসনব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত। তবে এই রাজ্যবিস্তার নীতির মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি। অন্যান্য সাম্রাজ্যবিস্তারকামী ইংরেজদের মতোই ডালহৌসীর এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের কম কাটতির কারণ ঐ রাজ্যসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া এই গোত্রীয় শাসকরা ভাবতেন যে, তাদের 'ভারতীয় মিত্ররা' ইতিমধ্যেই তাঁদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল যে উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের পক্ষে প্রশাসনিক অক্ষমতার কারণটি এই মিত্রতাকে জীর্ণ করে দিয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ডালহৌসী 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-কে কাজে লাগিয়েছিলেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপক আর্থিক ব্যয় খানিকটা লাঘব করার জন্যেও ডালহৌসী এই আশ্রিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই নীতি অনুসারে কোনো 'আশ্রিত' রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হত। চিরাচরিত 'হিন্দুপ্রথা' অনুসারে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি 'দত্তক' পুত্রের পাওয়ার কথা। ডালহৌসীর আইনে এটা মানা হয়নি। জীবিত অবস্থায় আশ্রিত 'অপুত্রক' রাজা যদি কোনো 'দত্তক' পুত্র নিয়ে থাকেন এবং এটি যদি ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ দ্বারা আগে থেকেই অনুমোদিত হয়ে থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই রাজ্যটি আশ্রিত রাজ্য হিসাবে টিকে থাকবে—স্বত্ববিলোপ নীতি এইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। অতএব, ১৮৪৮ সালে সাতারা, ১৮৫৩ সালে ঝাঁসি এবং ১৮৫৪-তে নাগপুর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে।

লর্ড ডালহৌসী বহু ভূতপূর্ব রাজা বা শাসকের সনদ ও উপাধি বাতিল করে দেন, প্রাপ্য বৃত্তিও (যেমন পেশবা) বন্ধ করে দেন। কর্ণাটক ও সুরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়।

অযোধ্যা রাজ্যটিকে গ্রাস করবার জন্য লর্ড ডালহৌসী ব্যগ্র ছিলেন। ১৮০১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরবর্তীকালে 'আউধের' অবস্থা ক্রমশ হীন হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যান্ড প্রমুখ গভর্ণর জেনারেলরা প্রত্যেকেই 'আউধের' প্রশাসনিক সংকট নিয়ে নবাবকে সতর্ক করলেও তার কোন উন্নতি হয়নি। ডালহৌসী এর প্রতিকারকল্পে তিনটি উপায় দর্শান—অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে বা অযোধ্যার নবাব কিছুদিনের জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কোম্পানিকে সঁপে দিয়ে অথবা

অযোধ্যাকে দখল করে নিয়ে—এই সমস্যার সমাধান ঘটানো সম্ভব। যেহেতু বক্সার-যুদ্ধের আমল থেকে 'আউধের' নবাব ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন, এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে এই রাজ্য গ্রাস করা যেত না। ফলে ডালহৌসী বা কোম্পানিকে প্রশাসনিক নিপীড়ন থেকে অযোধ্যার প্রজাদের উদ্ধার করার সাধু উদ্দেশ্য দর্শানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অতএব, ডালহৌসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, যে, নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ ঠিকমতো রাজ্যশাসনে মনোযোগী নন। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি 'নবাবকে ' ভাতা দিয়ে অযোধ্যা গ্রাস করে।

এতে সন্দেহ নেই অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ সংকটে অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মতো নবাবরাও স্বার্থপরভাবে ভোগবিলাসে ব্যস্ত থেকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য কোম্পানির কূটনীতি ও ধুরন্ধর রাজনৈতিক চালও কম দায়ী ছিল না। ১৮০১ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কোম্পানি পিছন থেকে নবাবের স্বাধীন ক্ষমতায় লাগাম টেনে ধরে ও অযোধ্যা-র রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারে দাবিদাওয়া বাড়িয়েই চলে। ডালহৌসীর হৃদয় অযোধ্যার প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ওঠার একটা গূঢ় কারণ ছিল এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল এই রাজ্যটি ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পসম্ভারের খুব ভালো বাজার হতে পারে, এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজ্যটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব দরকার হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পে কাঁচাতুলার অভাব দূর করার জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসী নিজামের হাত থেকে বেরার প্রদেশের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। কারণ এই এলাকা তুলা উৎপাদনে সমৃদ্ধ ছিল। বিশেষত ১৭৮৪ সালের পর থেকে দেখা যায়, গুজরাট ও চীনদেশের মধ্যে তুলা রপ্তানির ব্যবসা এত লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যে কোম্পানি ও তার বেসরকারি বণিকরা ক্রমশই পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অযোধ্যা ও উল্লিখিত অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ছাড়াও ডালহৌসী দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে (১৮৪৮-৪৯) পাঞ্জাব দখল করেন। এক্ষেত্রেও মূলতানের একটি সামান্য বিদ্রোহ ও দুজন কোম্পানির কর্মচারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বাধে। ডালহৌসী এই কারণে সমালোচিত হন, যে বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল কোম্পানি ও মহারাজা দিলীপ সিং ছিলেন নাবালক শাসক ও কোম্পানিরই অভিভাবকত্বে। তাঁকে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত করা অন্যায় ছিল।

এই ব্যাপক আগ্রাসী অভিযানের ফলে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যত দেশীয় রাজ্য কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে, তা আয়তনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর দ্বিগুণ ছিল এবং অন্য যে-কোনো গভর্নর-জেনারেলের অধীনে দখলিকৃত এলাকারও দ্বিগুণ।

২(খ).৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন

ব্রিটিশ কর্তৃক কোনো দেশীয় রাজ্য অধিকারের আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোনোরকমেই ভারতীয় রাজ্য বলা চলত না। পুরোপুরি ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এর সবকিছুই ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ-ভারতের জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থার কোনো তফাত ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য

ছিল ব্রিটিশের দিক থেকে একটা শাসনতান্ত্রিক লাভ। ভারতীয় জনগণের অবস্থায় কোনো গুণগত পরিবর্তন এই মালিকানা-বদল আনতে পারেনি।

অতএব, শেষ বিচারে যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রকৃত কারণ খোঁজা হয়, তাহলে বিচার্য বিষয়গুলি হবে অবশ্যই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে ক্ষমতায় আসে, কারণ তা অধীনস্থ সামরিক বাহিনীকে খুব মূল্যবান আর্থিক নিরাপত্তার যোগান দিতে পারে। বাংলার রাজস্বের ওপর দখল ক্রমশই উপকূলীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর দখল নিতে সাহায্য করে। এই দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ না থাকলে ভারতব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে সম্ভভব হত না। বাণিজ্যিক লাভের অঙ্ক যে কী পরিমাণ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পিছনে কাজ করেছিল তা বোঝা যায় কোম্পানির পশ্চিম উপকূল দখলের দৃষ্টান্তে। চীনের বিকাশশীল বাজারে রপ্তানির জন্য তুলা উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ১৭৮৪ সালের পর কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছিল। ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে গুজরাট থেকে বোম্বাই হয়ে প্রেরিত তুলার পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকায়। বোঝাই যাচ্ছে, বেইলির মতে—"The company was drawn into conquest in the Western Deccan and Central India Primarily because the demand of its fiscal and military machine."

এছাড়াও, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে নয়, অধীনস্থ দেশীয় মিত্রশক্তিবর্গ ও নির্ভরশীল দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে গূঢ় কূটনৈতিক কৌশলে বা চালে নিজস্বার্থে ব্যবহার করেও কোম্পানি কার্যোদ্ধার করেছিল। অধীনস্থ রাজা বা নবাবদের সামরিকভাবে নিবীর্য করে দিলেও, তাদের সম্পদ বা আর্থিক সংগতিকে সুকৌশলে কোম্পানি তার সাম্রাজ্যবিস্তারে বা বিদ্রোহ দমনে ব্যবহার করত। এক্ষেত্রে দেশীয় অধীনস্থ শক্তিবর্গকে স্বজাতিরই বিদ্রোহ দমনে খুব সুকৌশলে ব্যবহার করেছিল কোম্পানি (যেমন সিন্ধিয়া ভোঁসলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গায়কোয়াড়কে সহযোগী হিসাবে কোম্পানির ব্যবহার)।

২(খ).৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবিস্তারের পিছনে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব কী? সাম্রাজ্যবিস্তারে সাফল্যের জন্য কী কী কৌশল অবলম্ভবন করা হয়েছিল?

২। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি ও রাজ্যজয় বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৩। কী কারণে মারাঠাশক্তি ব্রিটিশদের কাছে পরাস্ত হয়?

৪। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ব্রিটিশদের অযোধ্যা নীতি কী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৫। 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-র মূল সূত্র কী ছিল?

৬। বেসিনের সন্ধি ও সলবঈ-এর চুক্তির সময় ও স্বাক্ষরকারীদের নাম লেখ।

২(খ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Burke, Salim Al-Din Qureishi : *The British Raj in India : An Historical Review.*

২। A. C. Banerjee. : *The New History of Modern India.*

৩। বিপান চন্দ্র (অনুবাদ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত) : আধুনিক ভারত।

৪। C. A. Bayly : *The New Cambridge History of India : Indian Society and the Making of the British Empire.*